জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

১৯৭০ সালের পূর্ব বাংলার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নারীসমাজের ভূমিকা

মো. নুরুল আমিন* ও আনোয়ারা আক্তার**

Abstract

Cyclone and tidal wave followed by a natural phenomenon in Bangladesh. Due to the geographical position of sea and rivers in one side, in the past Bangladesh was witnessed many cyclone and hurricanes. But the Cyclone of 1970, prior to the election, broke all the previous records causing countless havoc to life. In the history, this incident is known as great disaster. The most striking event was the frigidity of the then West Pakistani government. National emergency was not declared even through nearly 1 million people was at a loss. The provincial government did not receive any aid or relief. Even foreign aids could not be sent in the distressed areas on time due to the lack of aero plane or helicopters. However, political parties, student, different women federations of East Pakistan played important role to face the crisis. Specially the women folk played important role to the distribution relief goods. In every historical event and movement women played important role in this country. In line with this, during the crisis of 1970 the women of East Pakistan played active role also. They participated in relief collection and distribution besides invite people of all sectors to stand with the distressed. A humble attempt will be made in this article to analyze the important role of women played during the cyclone and tidal wave of 1970.

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস পৃথিবীর ইতিহাসে এক মহাদুর্যোগ হিসেবে অভিহিত। সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়-ক্ষতি অতিক্রম করেছিল অতীতের সকল রেকর্ড। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন ও শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ যখন তাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে উন্মুখ, ঠিক তখনই পূর্ব বাংলার উপর আঘাত হানে এই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অর্জন করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জয়ী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শুরু করে নানা টালবাহানা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্রই বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে; যার মাধ্যমে অভ্যুদয় ঘটে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে শীঘ্রই নির্বাচন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর। ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের এবং ১২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
**সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। যদিও অনেকে নির্বাচনের তারিখ পেছানোর দাবি তুলেছিলেন বর্ষা মৌসুম ও আসন্ন রমজান মাসের অজুহাতে। ইতোমধ্যে ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলায় বড় রকমের বন্যা হয়। এতে প্রায় ১৯টি জেলার ১৫টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৫ আগস্ট (১৯৭০) নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও ১৫ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।[১] সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষ যখন উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনি প্রচারণা চালাচ্ছিল তখনই বাংলার ইতিহাসে ঘটে যায় ইতিহাসের ভয়াবহ মহাদুর্যোগ। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। এ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলবর্তী এলাকায় লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি হয়। মানুষ হয়ে পড়ে গৃহহীন, বসতহীন ও অন্নহীন। গাছ-পালা, ফসল, পশু-পাখি সব ধ্বংস হয়ে যায়। এ মহাদুর্যোগে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম অধ্যায়ের সূচনা করে। উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ এ দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতির সত্যতা ক্ষমতাসীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার স্বীকার করতে চায়নি। এমনকি প্রথম দিকে প্রচার মাধ্যমগুলোতে ভয়াবহ এই দুর্যোগের সঠিক সংবাদ পর্যন্ত পরিবেশিত হয়নি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও চীন থেকে ফেরার পথে ঢাকায় এসে বিমানে করে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে যৎসামান্য সাহায্য ও অনুদান ঘোষণা করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান। পরবর্তী সময়ে বিদেশি পত্র-পত্রিকায় এর সংবাদ প্রচার হওয়ায় সারা বিশ্বে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশ্বের অনেক দেশই সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। এ দুর্যোগ মোকাবিলায় পশ্চিম পাকিস্তান সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণ ক্ষমতাসীন পাকিস্তান সরকারের এহেন আচরণে চরম ক্ষুব্ধ হয়। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রায় প্রতি বছর পূর্ব বাংলা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়তে থাকে। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলার কিছু কিছু অঞ্চলে টর্নেডো আঘাত হানে, জান-মাল ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। তখনও আইয়ুব সরকার তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবিলা ও সঙ্গী করেই দিনাতিপাত করতে হয়েছে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষকে। কিন্তু ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে তা অন্য যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতিকে অতিক্রম করে যায়। এ ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জ্বলোচ্ছ্বাস বৃহত্তর বরিশাল, নোয়াখালী, খুলনা ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে তীব্র আঘাত হানে। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জনপ্রাণিশূন্য এক বিরানভূমিতে পরিণত হয়। এ ঘূর্ণিঝড় ও জ্বলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় দশ লক্ষ মানুষ।[২] যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে ১২ নভেম্বর ঘটে যাওয়া এ ঘূর্ণিঝড়ের খবর পূর্ব বাংলার অন্য এলাকার মানুষ জানতে পারে ১৪ নভেম্বর এবং ৩ দিন পর ১৫ নভেম্বর সংবাদপত্রগুলোর খবর অনুযায়ী এতে প্রায় ২ লাখ লোক মারা যায়।[৩] এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগণিত মানুষের মৃত্যুর জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা বহুলাংশে দায়ী ছিল। কারণ সরকার কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের আগাম কোন সতর্কবার্তা না থাকায় প্রাণহানির সংখ্যা পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে। তাছাড়া ঘূর্ণিঝড়পরবর্তী ত্রাণকার্য এবং উদ্ধারকার্যক্রমে পাকিস্তান সরকার সাহায্য করাতো দূরে থাক বরং সরকার ও পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমগুলো তা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। তাদের এ অবহেলা, উদাসীনতা, প্রদেশবাসীর জানমালের জন্য কোনরূপ দায়-দায়িত্ববোধের অভাব পূর্ব বাংলার জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

পূর্ব বাংলার এ বিক্ষুব্ধ পরিবেশে সমগ্র প্রদেশ থেকে ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে নারীরাও আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, বদরুন্নেছা আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদা খানম প্রমুখ। দুর্যোগ মোকাবিলায় নারীরা ত্রাণ সরবরাহ করে তা বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় পূর্ব বাংলার নারীসমাজের ভূমিকা। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসে নারীদের ভূমিকা কোনো অংশেই কম নয়। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে পূর্ব বাংলার নারীদের ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডেও নারীরা ছিলেন সর্বদা তৎপর। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের দুর্যোগ মোকাবিলায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করে পূর্ব বাংলার নারীরা। এ বিষয়ে পর্যালোচনা আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়।

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

পূর্ব বাংলার ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে মর্মান্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগটি আঘাত হানে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে। ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসটি ১৯৭০ সালের (১২ নভেম্বর ২৬ কার্তিক ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, ১১ রমজান ১৩৯০ হিজরি রোজ বৃহস্পতিবার) আঘাত হানে।[৪] প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু ১২ নভেম্বরে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়টি অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেয়। যার জন্য দায়ী সরকারের উদাসীনতা। তাছাড়া আবহাওয়া বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমগুলো সময় মতো কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রীয় বেতার ও টেলিভিশন এবং আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের খবর গুরুত্বসহকারে প্রচার করেনি। আগাম কোনো সতর্কবার্তা প্রদান না করায় এবং আবহাওয়া দপ্তর রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে চিরাচরিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ঝড়ের হুঁশিয়ারি প্রদানের ক্ষেত্রে বিপদ সংকেতের নম্বর উল্লেখ না করায় মহাপ্রলয় সম্পর্কে উপকূলীয় জেলা ও দ্বীপসমূহের মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।[৫] বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়টি ১২ নভেম্বর রাতে ঘণ্টায় ক্ষেত্র বিশেষে ১৫০ মাইল বেগে উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে ২০-৩০ ফুট জলোচ্ছ্বাস হয় যাতে ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত হয়। বাংলার উপকূলীয় ৫টি জেলা বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনা এই ধ্বংসলীলার কবলে পড়ে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় তাৎক্ষণিক ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সঠিক খবর প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম দিকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু সরকারিভাবে ১৪ নভেম্বর রাত পর্যন্ত ১১,১৩৬ জনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করা হয়।[৬] ১৪ নভেম্বর *দৈনিক ইত্তেফাকে* ৮০০ মৃতদেহ উদ্ধারের কথা প্রকাশ করা হয়। ১৬ নভেম্বর সরকারিভাবে ১৬ হাজার লোক নিহত হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়।[৭] প্রাদেশিক রিলিফ কমিশনার এ. এম. আনিসুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান যে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে নিহতের সংখ্যা ৩৩ হাজার, এর মধ্যে নোয়াখালীতে নিহতের সংখ্যা ১২ হাজার। তিনি আরও জানান যে, ২৩৩৮ বর্গমাইল এলাকাব্যাপী ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার

লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৫টি জেলার ১৭টি থানার ১৬৪টি ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; ২৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং ১ লক্ষ ১৭ হাজার ঘরবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২ লক্ষ ৭৭ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান ৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।[৮] *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় ক্ষয়-ক্ষতির যে হিসাব প্রকাশ করে এক নজরে তা নিম্নরূপ :[৯]

নিহত:	প্রায় ২ লক্ষ (বেসরকারি হিসাব)
	৩৩ হাজার (সরকারি হিসাব)
	১ লক্ষ (এপিপি সংবাদ)
নিখোঁজ:	প্রায় ১ লক্ষ (বেসরকারি হিসাব)
ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা:	২২ লক্ষ ৩৩ হাজার
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা:	২,৩৩৮ বর্গমাইল
ঘরবাড়ি বিনষ্ট:	২৪ লক্ষ (বেসরকারি হিসাব)
	৩ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার (সরকারি হিসাব)

তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের মতে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক নিহত, আনুমানিক ৩ লক্ষ লোক নিখোঁজ, প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বাড়িঘর, ফসল, গবাদিপশু বিনষ্ট হয়েছে।[১০] ২৫ নভেম্বর সরকারিভাবে প্রায় ২ লক্ষ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯০ জন নিহতের খবর প্রকাশ করা হয়। নিখোঁজ রয়েছে ২৩,৯৮৭ জন।[১১] অবশ্য মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ২০ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।[১২]

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা ও প্রচার মাধ্যমগুলোর অবহেলায় আগাম কোনো সতর্কবার্তা না পাওয়ায় এ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাড়তে থাকে প্রাণহাণির সংখ্যা। এমনকি ১১ নভেম্বর মধ্যরাতে ঘটে যাওয়া প্রলয়ংকরী এ মহাদুর্যোগের কথা বাংলা তথা সমগ্র বিশ্ববাসী জানতে পারে ৩ দিন পর অর্থ্যাৎ ১৪ নভেম্বর। ৩ দিন পর খবরের কাগজগুলো অনুমান করে প্রায় ২ লাখ লোক নিহত হয়েছে।[১৩] এ সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ছিলেন চীন সফরে। তিনি চীন সফর শেষে নামমাত্র বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে যান। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী পূর্ব বাংলার এ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কথা জানার পর আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন। ব্রিটিশ ও মার্কিন নৌবাহিনী মানুষকে উদ্ধার এবং মৃত মানুষের দাফন কার্যে এগিয়ে আসে।[১৪] এসকল কাজে ক্ষমতাসীন সরকারের পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ত্রাণ আসলেও সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের জন্য পাওয়া যায়নি পাকিস্তানি কোন হেলিকপ্টার বা বিমান। প্রকৃতপক্ষে ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে কোনোরূপ সহায়তা প্রদান করেননি। সামান্য অনুদান ঘোষণা করে তারা তাদের দায়িত্ব শেষ করে। ত্রাণ বিতরণে হেলিকপ্টার বা বিমান ব্যবহারের বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর এস. এম. আহসান বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হেলিকপ্টার চেয়ে পাঠানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু কেন পাঠানো হয়নি তা তিনি জানেন না।[১৫] এমনকি দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোতে জাতীয় জরুরি অবস্থা পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়নি। এতেই পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের মনোভাব উপলব্ধি করা যায়।

২৩ নভেম্বর (১৯৭০) সংঘটিত মানব সভ্যতার বৃহত্তম ধ্বংসলীলার প্রতি সরকারের সীমাহীন অবহেলার কথা উল্লেখ করে পূর্ব বাংলার ১১ জন রাজনৈতিক নেতা প্রেসিডেন্টের নিকট একটি তারবার্তা পাঠান।[১৬] তারবার্তায় স্বাক্ষরকারীগণ হলেন- মওলানা ভাসানী, নূরুল আমীন, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, আতাউর রহমান খান, খাজা খয়ের উদ্দিন, গোলাম আজম, খান এ সবুর, এ এস এম সোলায়মান, মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া এবং গরীবনেওয়াজ। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ত্রাণ তৎপরতাসহ দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১২ নভেম্বর খুলনায় নির্বাচনি প্রচার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি নির্বাচনি সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ রেখে ১৮ নভেম্বর উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনে ভোলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।[১৭] দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলিতে ত্রাণ বিতরণ শেষে ঢাকায় ফিরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করেন এবং সাথে তুলে ধরেন পাকিস্তানি সরকারের সীমাহীন উদাসীনতা ও ব্যর্থতার কথা।[১৮] ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার জন্য যেমন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সামান্যতম উদ্বেগ ছিলো না; তেমনি ১২ নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের যে অবহেলা ও উদাসীনতা তা প্রমাণ করে পূর্ব বাংলাকে তারা উপনিবেশ হিসেবে মনে করে। সুতরাং পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা যেন মুক্ত জনতা হিসেবে জীবন যাপনের অর্থাৎ নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নিয়ন্ত্রণে সংকল্পবদ্ধ হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মওলানা ভাসানী সন্দ্বীপ, হাতিয়া, রামগতি, ভোলা, বরিশাল, শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জ প্রভৃতি দুর্গত এলাকা সফর করেন। দুর্গত এলাকা সফর শেষে ঢাকায় ফিরে এসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি জনগণের এই জরুরি মুহূর্তে পূর্ব বাংলায় উপস্থিত থেকে সাহায্য কাজ তদারক না করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সমালোচনা করেন। তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানে এই ভয়াবহ দুর্যোগের দিন যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, প্রদেশের সাত কোটি মানুষ তা কোনোদিন ভুলবে না। তিনি সাংবাদিকদের জানান, এই দুর্যোগে ১০ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে। তিনি সর্বদলীয় উদ্যোগে একটি জাতীয় রিলিফ কমিটি গঠনের আবেদন জানান।[১৯]

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতায় নারী

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় দশ লক্ষ মানুষ। পশ্চিম পটুয়াখালী থেকে পূর্ব সন্দ্বীপের উপকূল ও দ্বীপাঞ্চল, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা ও চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তর জনমানবহীন বিরানভূমিতে পরিণত হয়। পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমগুলো ক্ষয়-ক্ষতির সঠিক চিত্র ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও পরবর্তীকালে বিদেশি গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে বিশ্ববাসী তা জানতে পারে। পূর্ব বাংলার এ শোক বিহ্বল পরিবেশে সারা দেশ থেকে ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নারীরা আর্ত-মানবতার সেবায় এগিয়ে আসে।[২০]

১২ নভেম্বর উপকূল অঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের খবর যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ হচ্ছিল তখন দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে যায়। দেশের আপামর জনসাধারণ এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে

ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। নারীরা এ সময়ে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের হয়ে কিংবা কখনও কখনও ব্যক্তিগতভাবে আর্ত-মানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন। তারা ত্রাণ বণ্টন, ত্রাণ সংগ্রহ এবং বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নিহত মানুষের লাশ দাফন এবং দুর্গত এলাকার উদ্ধারকার্য, চিকিৎসাকার্য, খাদ্য ও পানি সরবরাহ ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা রিলিফ বণ্টনেও পরিলক্ষিত হয় চরম অব্যবস্থাপনা। দুর্যোগের ৯ দিন পরেও অনেক স্থানে ত্রাণ পৌঁছায়নি। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি নারীরা দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণ বণ্টন ও তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে যেসব নারীরা এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বেগম সুফিয়া কামাল, মতিয়া চৌধুরী, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, বদরুন্নেছা আহমেদ, মালেকা বেগম, সুলতানা জামান প্রমুখ। ঘূর্ণিঝড়ে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে ১৮ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন, বুলবুল একাডেমি, ছায়ানট ও অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে একটি শোক মিছিলের আয়োজন করা হয়। যেখানে অংশগ্রহণ করেন শহরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী, ছাত্র ও সাধারণ জনগণ। অংশগ্রহণকারী সবাই নগ্নপদে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন। শোক মিছিলটি প্রেস ক্লাব থেকে শুরু হয়ে জিন্নাহ এভিনিউ নবাবপুর, টিপু সুলতান রোড, হাটখোলা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও কার্জন হল হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে সমাপ্ত হয়। এ শোক মিছিলে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন লায়লা আরজুমান্দ বানু, ফেরদৌসী রহমান, আফসারী খানম, অজিত রায়, মাহমুদুন্নবী, এবং খন্দকার ফারুক আহমেদ প্রমুখ। শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। [২১]

উপকূলীয় এ জলোচ্ছ্বাসের পর কবি সুফিয়া কামাল ও অধ্যাপক সুলতানা জামানের উদ্যোগে মহিলা পরিষদ ও অন্যান্য নারী সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রাণতৎপরতা চালায়।[২২] ড. সুলতানা জামান এর উদ্যোগে এবং কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে দেশের নারীসমাজ, ডাক্তার ও সমাজকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রাণকাজে অংশ নেন। ড. সুলতানা জামান ১৯৭০ সালের এ দুর্যোগের সময়ে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে অন্যান্য নারীরা রিলিফ ওয়ার্ক করেন এবং জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনকে তেজোদীপ্ত করেন। কামরুন্নাহার লাইলী, মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, মিনু বিল্লাহ, সুলতানা কামাল, সাইদা কামাল, ডালিয়া, সামসুদ্দিনসহ আরো অনেকে ছিলেন তাঁর সাথে।[২৩] এ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দুর্গত মানুষের পাশে দাড়ানো আরেক নারী হলেন নারী আন্দোলনের পুরোধা নারীনেত্রী মালেকা বেগম। তাঁর গ্রন্থেও একটি উদ্ধৃতি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

> ১৯৭০-এর নভেম্বরে উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস এদেশের ওপর হেনেছিল প্রচণ্ড আঘাত। অধ্যাপক সুলতানা জামানের উদ্যোগে মহিলা পরিষদ ও অন্যান্য নারী সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমরা প্রায় ৭ দিন বরিশাল- ভোলায় অসহায় মৃতপ্রায় মানুষের মধ্যে ত্রাণ কাজ চালিয়েছিলাম কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে।[২৪]

বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসে 'অগ্নিকন্যা' নামে খ্যাত মতিয়া চৌধুরী ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় মতিয়া চৌধুরী

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চরভাটা, চরজব্বার, চরক্লার্কে দিনের পর দিন রিলিফের কাজ করেন। তাছাড়া ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাশেদা খানম ও তাজুন্নাহার ক্ষতিগ্রস্ত ভোলার চর জব্বার ও চরভাটা এলাকায় ত্রাণকার্যে অংশ নেন। তারা ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের মাঝে ঔষধ, দুধসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।[২৫] পূর্ব পাকিস্তানের ন্যাপ কার্যকরী কমিটির সদস্য মতিয়া চৌধুরী দুর্গত মানুষের কথা চিন্তা করে নির্বাচন সাময়িক স্থগিত করে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'সরকার দায়িত্ব পালনে সম্পূণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি না করিলে, আন্দোলন না করিলে সরকারকে দুর্গতদের রক্ষায় বাধ্য করা যাইবে না।'[২৬] তাঁর নেতৃত্বে একটি দল সাহায্য সামগ্রী নিয়ে পটুয়াখালীতে পৌঁছায়।[২৭]

এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আরেক নারী হলেন আমেনা বেগম।[২৮] তিনি দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে ত্রাণ তৎপরতা চালানোসহ বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে দুর্গতদের সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর বিবৃতিতে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের জন্য শোক এবং দুর্দশাগ্রস্ত হাজার হাজার নর-নারীর প্রতি গভীর শোক এবং সমবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি ঘূর্ণিদুর্গত এলাকাসমূহকে 'দুর্গত এলাকা' ঘোষণা এবং অবিলম্বে সকল এলাকায় সাহায্য প্রেরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।[২৯] তাছাড়া তিনি দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত নোয়াখালী যান এবং তারা দলের সকল নিবাচনি কর্মসূচি বাতিল করে সকল নেতা-কর্মীদের মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৩০]

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হেনা দাস এক বিবৃতিতে নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকাসমূহের উপর দিয়ে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড়ে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তাদের আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গৃহহারা ও সর্বহারা দেশবাসীর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষক সমিতির সকল ইউনিট ও সদস্যদেরকে দুর্গত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগের অনুরোধ জানান।[৩১] এছাড়া হেনা দাসের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে দুর্গতদের সাহায্যার্থে ১ হাজার টাকা দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩২] দুর্গতদের সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে মিসেস এম. হাসানের সভাপতিত্বে মহিলা রিলিফ কমিটি গঠন করা হয়। [৩৩] ন্যাপ নেত্রী সেলিনা বানু দুঃস্থ মানবতার সেবায় একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান ।[৩৪] তিনি দুর্গত এলাকায় সফর ও ত্রাণ বিতরণ শেষে এ আহ্বান করেন।[৩৫]

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ।[৩৬] তাছাড়া রাফিয়া আক্তার ডলিও ১৯৭০ সালের বাংলার এ ভয়াবহ দুর্যোগে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন।[৩৭]

ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে খুলনার দুবলার চর ডুবে যায় এবং প্রচুর লোকের প্রাণহানি ঘটে। এ এলাকায় এ সময়ে ত্রাণ বিতরণের কাজ করেন খুলনার মেয়ে কৃষ্ণা রহমান।[৩৮] এছাড়া ত্রাণ বিতরণে আরও কাজ করেন- হালিমা খন্দকার রেণু। ১৯৭০ সালের এ মহাদুর্যোগে সরকারি সাহায্য সহযোগিতা না পাওয়া নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া সহায় সম্বলহীন মানুষগুলোর জন্য বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ও তাঁর সহযোগী বন্ধু ফাতেমা খন্দকার, রহিমা সিদ্দিকীসহ অনেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত এক হাজার টাকার একটি চেক বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেন। এছাড়া দুর্যোগকবলিত এলাকায় মমতাজ শেফালী অংশগ্রহণ করে নারীদের অগ্রযাত্রার হাতকে সম্প্রসারিত করেছিলেন।[৩৯] দক্ষিণাঞ্চলের চরসীতায় ত্রাণ বিতরণের কাজ করেন ঐ অঞ্চলের মেয়ে শিবানী

দাস। ১২ নভেম্বরের এ মহাদুর্যোগের সময়ে শিবানী চরসীতায় অবস্থান করেছিলেন এবং প্রায় মাস খানেক তিনি বিধ্বস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণের কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা চিড়া, মুড়ি ও খাবারের পানি সহযোগে দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। এছাড়া ত্রাণ বিতরণের কাজে অংশ নেন শিশির কণা ভদ্র, তোলারাম কলেজের ছাত্রী দীপা ইসলাম। হেনা দাসের কন্যা দীপা ইসলাম ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশ নেন।[৪০] এছাড়া যারা ত্রাণ কার্যে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঊষা দাশ, ষোড়শী চক্রবর্তী, হোসনে আরা বেবী, মাজেদা খাতুন, প্রমুখ। কবিরত্ন খ্যাত তাইবুন নাহার রশীদ ঢাকা থেকে রেডক্রস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে রিলিফ সংগ্রহ করে চরাঞ্চলে দুস্থ ও দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন।[৪১] ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ত্রাণ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন অঞ্জু গাঙ্গুলী।[৪২] এছাড়া ত্রাণ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত আরেক নারী হলেন নুরুননাহার ফয়জেননেসা। ১৯৭০ সালের এ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময়ে তিনি রিলিফ ওয়ার্ক করেন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে কাপড়, টাকা পয়সা, চাঁদা তুলে মহিলা পরিষদে জমা দেন।[৪৩]

এ দুর্যোগকালীন সময়ে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। এর মধ্যে রোকেয়া হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা রাশিদা খানম রানার নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবী সংসদের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল করে বেঁচে যাওয়া টাকা থেকে তিন হাজার টাকার রিলিফ সামগ্রী নিয়ে নোয়াখালীর উপদ্রুত এলাকায় বিতরণ করেন।[৪৪] ইডেন কলেজের পক্ষ থেকে ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা মিস মুর্শীদা করিম আলো এক বিবৃতিতে সরকারের রিলিফ কার্যে প্রেসিডেন্টের সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করেন। পাশাপাশি রিলিফকার্যে সরকারের উদাসীনতার সমালোচনা করেন এবং সুষ্ঠুভাবে রিলিফ বণ্টনের জন্য সরকারের নিকট দাবি করেন।[৪৫]

উপসংহার

ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের দেশ বাংলাদেশ। অসংখ্য নদী-নালা সমুদ্রবেষ্টিত পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্লাবন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পূর্ব বাংলার প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় এদেশে ১৪৮৪ সালে বরিশালে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দু লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। এ ঘূর্ণিঝড়ের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া না গেলেও এতে প্রাচীন বাংলার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রচুর ধ্বংসলীলার চিত্র পাওয়া যায়।[৪৬] অতীতের যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগটির তাণ্ডবলীলা ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল ব্যাপক। আগাম সতর্কবার্তার অভাবে উপকূলীয় এলাকার জনগণ বুঝতেই পারেনি দুর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে। তাছাড়া যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যমগুলোর উদাসীনতার ফলে বাংলার জনগণ প্রথমদিকে জানতেই পারেনি উপকূলীয় এলাকায় কি ঘটেছে। তাছাড়া এ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সরকারের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে।

১৯৭০ সালের এ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দশ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, সহায়-সম্বলহীন এ মানুষগুলোর সাহায্য সহযোগিতায় অন্যান্য সংগঠনগুলোর মতো এগিয়ে আসেন নারীসমাজ। নারীরা সংগঠনের হয়ে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। তারা ত্রাণ সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ, কাপড়-চোপড়, খাবার

সংগ্রহ করেছিলেন। আবার তারা দুর্গত এলাকায় দিনের পর দিন অবস্থান করে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষগুলোকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেন। ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে তারা সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ বিতরণের কাজ করেন। তাছাড়া তারা বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করেন এবং সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানান ত্রাণকার্যে অংশ নিতে। এভাবে নারীরা রিলিফ ওয়ার্ক করে, বক্তৃতা বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা প্রদান করেছিলেন যা ইতিহাসে অনেকটা অনালোচিত। আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীরা কতটা এগিয়ে ছিল তা ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারবে এবং তাদের মধ্যে উৎসাহ অনুপ্রেরণা কাজ করবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক আজাদ*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৬ নভেম্বর, 1970; *Morning* News, 16 November, 1970

২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০

৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক আজাদ* ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

৬. *দৈনিক আজাদ* ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

৭. *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

৮. *দৈনিক আজাদ*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক সংবাদ*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

৯. *দৈনিক আজাদ*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

১০. *দৈনিক আজাদ*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০

১১. *দৈনিক সংবাদ*, *দৈনিক আজাদ*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭০

১২. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭০

১৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫ নভেম্বর, ১৯৭০

১৪. *দৈনিক আজাদ*, ১৫-১৭ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫-১৭ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৫-১৭ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক সংবাদ*, ১৫-১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

১৫. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০

১৬. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭০; বিস্তারিত দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৫৭১-৫৭২

১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক আজাদ*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭০; *Morning News*,19 November, 1970; The Pakistan observer, 19 November, 1970

১৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক আজাদ*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৭০

১৯. *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ নভেম্বর, ১৯৭০

২০. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, প্রিপট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৪

২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭০; *দৈনিক সংবাদ*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

২২. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক রচিত *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৪, পৃ. ১২০

২৩. মালেকা বেগম, *একাত্তরে নারী*, (ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৪) পৃ. ৩২; সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৯-৪০

২৪. মালেকা বেগম, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৮

২৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৭৭ ও ২৪৪

২৬. *দৈনিক সংবাদ*, ২১ নভেম্বর, ১৯৭০

২৭. *ঐ*

২৮. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়ী আমেনা বেগম (১৯২৫-১৯৮৯)। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের নেত্রী ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের যখন গ্রেপ্তার করা হয় সে সময় ১৯৬৬ সালের ২৭ জুলাই আমেনা বেগমকে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। দলের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমেনা বেগম স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার চাপ সৃষ্টি করেন ও আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলেন। তিনি ছয় দফা কর্মসূচি আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের এগারো দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭০ এর কাউন্সিলে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ দাবি করেছিলেন। কিন্তু তা না করায় পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন ও আতাউর রহমান খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নতুন দল জাতীয় লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৮৪ সালে এ দলের সভাপতি হন।
http://bn.banglapedia.org/index.php?title= বেগম,_আমেনা

২৯. *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০

৩০. *দৈনিক সংবাদ*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

৩১. *দৈনিক সংবাদ*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭০

৩২. *দৈনিক সংবাদ*, ২১ নভেম্বর, ১৯৭০

৩৩. *দৈনিক সংবাদ*, ২১ নভেম্বর, ১৯৭০

৩৪. সেলিনা বানু (১৯২৬-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) ত্রিশের দশকে পর্দা প্রথার যুগে আত্মমর্যাদা সচেতন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী পাবনায় জন্মগ্রহণকারী এ নারী কমিউনিস্ট রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেন। আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন এবং মওলানা ভাসানী কর্তৃক ন্যাপ গঠিত হওয়ার পর তিনি ন্যাপের রাজনীতিতে যোগ দেন। সেলিনা বানু যুক্তিবাদী বক্তা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। হেনা দাস, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৪

৩৫. *দৈনিক সংবাদ*, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০

৩৬. বাংলাদেশের শিক্ষাজগত ও রাজনীতিতে সুপরিচিত বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ (১৯২৪-১৯৭৩ খ্রি.)। প্রগতিশীল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কিংবদন্তি শিক্ষাবিদ, সামাজিক কর্মী ও রাজনীতিবিদ বদরুন্নেছা আহমেদের দৃঢ়তা, কর্ম উদ্যোগ ও আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রী পরিষদে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ.২১ ; *ঞযব উধরষু ঝঃধৎ*, অঢ়ৎরষ ২৫, ২০১৮

৩৭. প্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মিসেস রাফিয়া আক্তার ডলি (১৯৪৫ সালের টাঙ্গাইল জেলায়) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। স্কুলজীবন থেকেই ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনসহ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সর্বোপরি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। মমতাজ বেগম, মফিদা বেগম, *স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারী*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৭৮

৩৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০

৩৯. *ঐ*, পৃ. ২২০, ২৩৫

৪০. *ঐ*, পৃ. ২৩৯, ১৪২-৪৩, ২৪৩

৪১. মমতাজ বেগম, মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৪২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

৪৩. *ঐ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬-৩৭

৪৪. মোশাররফ হোসেন, *১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৭৪

৪৫. *দৈনিক আজাদ*, ২২ নভেম্বর, ১৯৭০

৪৬. *দৈনিক আজাদ*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০